

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৭

(শেষ পর্ব)

অভিজিৎ রায়

www.mukto-mona.com

‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ লেখা শুরু করেছিলাম হঠাৎ করেই। একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলো সহজ সরল ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমি ভাবিনি যে সিরিজটি পাঠকদের এত আদৃত হবে। অনেক পাঠক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ই-মেইল করে সিরিজটির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; অনেকে আবার বই আকারে প্রকাশ করে ফেলতেও উপদেশ দিয়েছেন। শেষ পর্বটি সমাপ্ত করতে অনেকটা সময় নিলাম। তিন মাসের উপরে। আসলে লেখা শুরু করার মত মুডই খুঁজে পাচ্ছিলাম না কেন যেন। হয়ত এটি অসমাপ্তই থেকে যেত যদি পাঠকদের কাছ থেকে নিরন্তর দাবী না আসত। আমি সত্যই আপ্ত। আমি অতি সাধারণ মানের লেখক। আমার লেখা যদি পাঠকদের সামান্য হলেও চিন্তার খোরাক জোগায়, তবেই আমার লেখার সার্থকতা। কোন পাঠক যদি এই সিরিজটির উপরে কোন গঠন মূলক সমালোচনা করেন তবে বাধিত হব।

এ প্রবন্ধটি রচনার জন্য বেশ কিছু বই, ওয়েব সাইট এবং পত্রপত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে; আর প্রবন্ধের শিরোনামটি ধার করা হয়েছে একটি বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গিতের লাইন থেকে।

অভিজিৎ

ইমেইল: charbak_bd@yahoo.com

৫/১২/২০০৩

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

বছর তিনেক আগের কথা। একবার একটি বাংলাদেশী ই-ফোরামে ফয়সাল হালিম নামের এক ভদ্রলোকের সাথে দর্শনগত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র ই-ফোরামগুলোতে লেখালিখি শুরু করেছি। ভদ্রলোক আমাকে তার জীবনের একটি ঘটনা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করে বললেন,

গতকাল আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলাম, পার্টিতে। কিন্তু বেরতে গিয়ে অযথাই আমার দেরী হয়ে গেল। কারণ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েই দেখি প্রচণ্ড বৃষ্টি। আমার বাড়ীর

চারপাশটা বৃষ্টির পানি জমে এমনভাবে ভরাট হয়ে ছিল যে, বন্ধুর বাসায় যাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো।

এমনি সময় আমার বাড়ীর পাশের একটা গাছ হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল আর তারপর জমে থাকা পানির উপর ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতেই গাছের ডাল-পালা বিল্ডিং এর এখানে ওখানে বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ে যেতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা এককথায় অবিশ্বাস্য - চোখের সামনে দেখলাম বিশাল গাছটি একটা নৌকায় পরিণত হয়ে গেল। এই নৌকায় চেপেই আমি অবশেষে আমার বন্ধুর বাসায় পৌঁছুতে পারলাম। অবাক ব্যাপার, তাই না? নৌকাটি ছিল একদম নিঁখুত, গ্রাম বাংলার মাঝিরা যে নৌকাগুলোয় দাড় বায় - একদম সেই রকম। এমন একটা নৌকা নিজে থেকেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই- আমার চোখের সামনে!

‘যত সব ননসেন্স’ - আপনি হয়ত ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠবেন -

‘কিভাবে একটা নৌকা কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজে থেকে তৈরী হয়ে যেতে পারে?’

‘আপনার এভাবে নিজে নিজে নৌকা তৈরী হয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে কেউ একজন যেন দোয়াতের বোতল থেকে কালি নিয়ে ইচ্ছে মত দিস্তে দিস্তে কাগজে ছিটিয়ে দিল আর তা সুন্দর একটা অভিধানে পরিণত হয়ে গেল!’

‘কিভাবে নৌকার মত একটা জিনিস কোন পরিকল্পনা ছাড়া, কারো প্রচেষ্টা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?’

তাহলে অভিজিৎ সাহেব, আমায় বলুন তো- যেখানে একটা সাধারণ নৌকাই কারো ইচ্ছে ছাড়া নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে আমাদের দেহের মত জটিল সিস্টেম হুট করে কোন কারণ ছাড়াই তৈরী হয়ে যেতে পারে?

কিংবা ,

কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্ব কারো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?’

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। যেখানে একটি নৌকা নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্বকে ‘সয়ন্তু’ বলে আমরা ভেবে নিতে পারি? কিভাবে ধারণা করতে পারি এই যে সুশৃঙ্খল বিশ্ব, প্রাণী-জগৎ, প্রকৃতি, গ্রহ-তারা এত সব কিছু নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়া? সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছে এ নয়নাভিরাম বিশ্ব? বললেই হল নাকি! মানব-মন সত্যই সায় দিতে চায় না এ ধরনের তথাকথিত ‘অবাস্তব’ অনুকল্পে। তাই আমাদের এই

বিশ্বজগতের পেছনে সত্যিকারের ‘পরম-পিতা’জাতীয় কেউ আছেন - এই স্বজ্ঞাত ধারণা তাড়িত করেছে, ভাবিত করেছে যুগে যুগে দার্শনিকদের। ৩৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সক্রেটিস তার একটি লেখায় বলেছিলেন - ‘With such signs of forethought in the design of living creatures, can you doubt they are work of choice or design?’ প্লেটোও ভেবেছেন যে, এই মহাবিশ্ব দেখে বোঝা যায় যে, এর পেছনে একজন নক্সাকার (Designer) রয়েছেন। তবে সবচাইতে সুন্দরভাবে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন উইলিয়াম পিলে নামে এক ধর্মজাজক ১৮০২ সালে তার ‘ন্যাচারাল থিওলজি’ নামের একটি বইয়ে :

‘ধরা যাক জঙ্গলে চলতে চলতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটি ঘড়ি কুড়িয়ে পেলেন। উনি কি ভেবে নেবেন যে ঘড়িটি নিজে থেকেই তৈরী হয়ে জঙ্গলে পড়ে ছিল, নাকি কেউ একজন ঘড়িটি তৈরী করেছিল?’

পিলের এই আরগুমেন্টটি দর্শন শাস্ত্রে পরিচিত হয়েছে - ‘Argument from Design’ নামে। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে বিগত সময়গুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমন অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব ‘তৈরীর’ পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন ‘কারিগরের’ হাত থাকতেই হবে; এই ধারণাটি একটা সময়ে আস্তিকদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হত। এখনও বেশ কিছু বাংলাদেশী ফোরামেই এই যুক্তিটি ঈশ্বরের বিশ্বাসের সপক্ষে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন *সদালাপ* ও *বাংলা-আমার*-নামের দুটি ‘বিশ্বাস নির্ভর’ ওয়েব-সাইটে ‘God Existence’ নামে একটি প্রবন্ধ রাখা আছে যার মূল সুরটিই হচ্ছে উইলিয়াম পিলের ঘড়ির কারিগর তত্ত্বের (Watchmaker argument) মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানের চেষ্টা। তবে যারা ‘নিরপেক্ষ’ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের চর্চা করে যাচ্ছেন, তাদের কাছে কিন্তু পিলের যুক্তির দুর্বলতা গুলো অনেক আগেই ধরা পড়েছে। Oxford Universityর অধ্যাপক রিচার্ড ডকিনস তার বিখ্যাত ‘The Blind Watchmaker’ বইয়ে এর অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এর কিছু তুলে ধরা হলঃ

১) ঘড়ির কারিগরের পিতা :

ঘড়ির যেমন ঘড়ির কারিগর থাকে, তেমনি প্রত্যেক কারিগরেরই থাকে পিতা। তাহলে মহাবিশ্বের কারিগর রূপী ঈশ্বরের পিতাটি কে? এই প্রশ্ন মনে আসাও স্বাভাবিক। আর সেই পিতার পিতাই বা কে ছিলেন, আর তার পিতা? - এমনি ভাবে প্রশ্নের ধারা চলতেই

থাকবে। এই প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেবে অন্তহীন অসীমত্বের দিকে। বিশ্বাসীরা সাধারণতঃ এই ধরনের প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে সোচ্চারে ঘোষনা করেন যে, ঈশ্বর সয়স্তু। তার কোন পিতা নেই, তার উদ্ভবের কোন কারণও নেই। তিনি অনাদি-অসীম। এখন এটি শুনলে অবিশ্বাসীরা/যুক্তিবাদীরা স্বভাবতই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইবেন, ‘ঈশ্বর যে সয়স্তু তা আপনি জানলেন কি করে? কে আপনাকে জানালো? কেউ জানিয়ে থাকলে তার জানাটিই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কি? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বর সয়স্তু বলে ভাবছেন, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া এটি ভাবতে অসুবিধা কোথায়?’ দর্শনশাস্ত্রে ‘অক্সামের রেজর’ (ভয় পাবেন না, এটি দাঁড়ি কামানোর কোন রেজর নয়) একটি সূত্র প্রচলিত আছে, যার নিরিখে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসটিকে সহজেই সমালোচনা করা যেতে পারে।

২) ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, আর নৌকা বানায় নৌকার কারিগর :

আমি প্রবন্ধের শুরুতে বর্ণিত ফয়সল হালিমের ঘটনাতে ফিরে যাই। বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটি নৌকা দেখে জনাব হালিমের নৌকাটির পিছনে কারিগর থাকার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু একটি নৌকা দেখে কি কারো মনে হতে পারে যে, একজন ঘড়ির কারিগর নৌকাটি বানিয়েছে? কখনই না। আমাদের স্বভাবতই মনে আসে নৌকার কারিগরের কথা। তেমনি ভাবে আমাদের সমাজে আমরা দেখি- জুতা বানায় জুতার কারিগর, ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, সোনার কাজ করে সোনার কারিগর (স্বর্ণকার)। একই কারিগর তো সবকিছু বানাচ্ছে না। একই যুক্তিতে তাহলে আমাদের সৃষ্ট জীবনের জন্য দরকার একজন জীবনীকার, সূর্যের জন্য চাই সূর্যকার (সূর্যের কারিগর), চন্দ্রের জন্য একজন চন্দ্রাকার, আর বৃষ্টির জন্য চাই একজন বৃষ্টিকার, ইত্যাদি। কিন্তু ঘড়ির জন্য ঘড়ির কারিগরের উপমা নিয়ে শুরু করলেও বিশ্বাসীরা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি বস্তুর জন্য যুক্তিহীন ভাবে একজনমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করে থাকেন।

৩) শূন্য হতে ঘড়িঃ সাইবাবার ম্যাজিকঃ

ঘড়ি বা নৌকা বানানোর জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা কিন্তু প্রকৃতিতে বিদ্যমান। নৌকার ক্ষেত্রে কাঠ পাওয়া যায় গাছ কেটে। ঘড়ির ভিতরের কল কজাগুলো বানানো হয় লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুথেকে। কিন্তু বলা হয়, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর এই মহাবিশ্বতৈরী করেছেন স্রেফ শূন্য হতে (ex Nihilo)। সুতরাং ঘড়ির কারিগরের সাথে মহাবিশ্বের কারিগরের মিল খোঁজার চেষ্টাটি ভুল।

৪) ভুল সাদৃশ্য :

ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্যটি আরেকটি কারণে ভুল তা হল, এখানে অবচেতন মনে ভেবে নেওয়া হচ্ছে যে, যেহেতু দুটি বস্তু একটি কমন বৈশিষ্ট্য বিনিময় করছে, অতএব, তাদের তৃতীয় একটি কমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। যেমন ধরা যাক নীচের উদাহরণটিঃ

- ঘড়ির গঠন জটিল
- ঘড়ির জন্য একজন কারিগর দরকার।
- মহাবিশ্বের গঠনও জটিল
- সুতরাং মহাবিশ্বের জন্য একজন কারিগর আবশ্যিক।

শেষ পদক্ষেপটি ভুল। কারণ, এটি এমন একটি উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে যা বিচারের নীতি বা নির্ণায়ক দ্বারা সমর্থিত নয়। উপরের যুক্তির ভুলটি নীচের আরেকটি উদাহরণের সাহায্যে আরো ভালভাবে পরিস্কার করা যায়ঃ

- পাতার গঠন জটিল
- পাতা গাছে জন্মায়।
- টাকার হিসাব (Money bills) এর গঠনও জটিল
- সুতরাং টাকা গাছে জন্মায় (এটি প্রবাদে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে নয়!)

৫) অসঙ্গতি :

পিলের আরগুমেন্টে ধরে নেওয়া হয়েছে ঘড়ির গঠন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত পাথর, খনিজ বা পাহাড়-পর্বতের মত সহজ সরল ও বিশৃংখল নয়। তাই তার কারিগর লাগবে। আবার একই সাথে মহাবিশ্বের গঠন ধরে নেওয়া হয়েছে জটিল এবং সুশৃংখল ('সহজ সরল' প্রকৃতি এর একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও)। তাই এটি একটি অসম তুলনা।

৬) চক্রাকার যুক্তি :

‘কে বানালাো এমন নিখুঁত মহাবিশ্ব?’ অথবা, ‘বলুন তো, আমাদের তৈরী করেছে কে?’ (Who created you?) -প্রায়শঃই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যুক্তিবাদীদের। কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তারা বোঝেন না যে, এধরনের প্রশ্ন বিজ্ঞানের চোখে অর্থহীন প্রশ্ন। সঠিক প্রশ্নটি হবে ‘এই সৃষ্টি রহস্যের প্রক্রিয়াটি কি?’ বা ‘আমাদের জীবন গঠনের মূল প্রিন্সিপালটি কি?’ এবং বিজ্ঞান সর্বদাই এধরনের প্রশ্নের উত্তর খুজতে সচেষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিতে সক্ষম। বিজ্ঞান আজ পরিস্কারভাবেই জানে যে মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোন ‘ঈশ্বর’ নামক কোন ‘বড় বাবু’ নন, বরং পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সহজ সুত্রাবলী (Laws of Physics)। আসলে এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই ঘটছে। প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক কারো পক্ষেই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে ডিঙ্গিয়ে কোন কিছু করা

সম্ভব নয়। কাজেই, আমাদের এ পর্যন্ত পাওয়া জ্ঞান থেকে বলা যায় ‘ঈশ্বর’ বলে কাউকে আভিহিত করতে চাইলে তা করা উচিত আসলে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণহীন সূত্রগুলিকে।

বিশ্বাসীদের তরফ থেকে করা ‘কে আমাদের বানিয়েছে’ এ ধরনের প্রশ্ন আরেকটি কারণে অর্থহীন তা হল, এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে উত্তরটি আগে থেকেই গ্রহন করে নেয়া হয়েছে -‘কে আবার বানাবে - ঈশ্বর!’। এটি নিঃসন্দেহে একটি loaded Question। অর্থাৎ ঈশ্বর আছে এটা ধরে নিয়েই এধরনের প্রশ্নকরে উত্তর খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের চক্রাকার প্রচেষ্টা। মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব জামান তার [Who Created you?](#) পবন্ধে ব্যাপারটি খুব পরিষ্কার ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেনঃ

The question "WHO" created you does not make any sense because one the question already assumes an answer, that **there IS a creator, and if there IS a creator then the answer to the question cannot be but a tautology: The creator created you. Surely the questioner did not ask the question to know the name of the creator. So it is a meaningless question. As I said the right question is WHAT (not WHO) is the CAUSE of the creation of life, IF there is any. And the answer is the one above I gave (And unanimously agreed upon by majority of leading Physicists and Biologists).**

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রাকৃতিক বিভিন্ন ‘দৈব’ ঘটনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে নানা ধরনের ‘অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বার’ কল্পনা করে নিয়েছে মানুষ। বনে হঠাৎ দাবানলে সমস্ত কিছু যখন পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তখন ভয়ে পেয়ে মানুষ এর পেছনে ‘অগ্নি দেবীর’ কল্পনা করে নিয়েছে। পূজো-অর্চনা করে সেই দেবীকে তুষ্ট করতে চেয়েছে বারেবারেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশায়। বৃষ্টি কেন হয় এ ব্যাপারটিও এক সময় মানুষের জানা ছিল না। তাই ঝড়-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রনের জন্য মুসলিমরা যেমনি ‘মিকাইল ফেরেস্টার’ কল্পনা করেছে হিন্দুরা করেছে ‘দেবরাজ ইন্দ্রের’ কল্পনা। কিন্তু আজ স্কুলের ছোট ছেলেটিও জানে মিকাইল ফেরেস্টা বা ইন্দ্রের হাতের কারসাজিতে নয়, বৃষ্টি হয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে জলচক্র (Water cycle) অনুসরণ করে। কিভাবে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, কিভাবে তা মেঘে পরিনত হয়, আর কিভাবে তা আবার বারিধারায় রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে তা আজ প্রাইমারী স্কুলের বইগুলোতেই পাওয়া যায়। এই পৃথিবীটা কিভাবে শূন্যে ঝুলে থাকে তা একসময় মানুষের জানা ছিল না, রহস্য সমাধান করতে গিয়ে মানুষ এই পৃথিবীটিকে বসিয়ে দিয়েছে কখনও এটলাসের কাঁধে, কখনও অদৃশ্য গরুর শিং এর উপর আথবা কোন দৈত্যাকার কোন কচ্ছপের পিঠে। কিন্তু আজকের স্কুলে পড়ুয়া ছাত্ররাও এটলাস-গরু-কচ্ছপ ছাড়াই স্রেফ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র খুব

ভালভাবেই শূন্যপথে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচলন ব্যাখ্যা করতে পারে। মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে মানুষ একসময় কল্পনা করেছে ‘অদৃশ্য আত্মার’। কল্পনা করেছে যমদূত বা আজরাইলের মত কাল্পনিক চরিত্রের। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আজরাইলের প্রাণহরনের গালগল্প বা আত্মার অমরত্ব ছাড়াই প্রকৃতি জগতের নিয়ম-কানুন দিয়ে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে পারছে। এ বিষয়ে আমার লেখা ‘প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে’ নামের একটি প্রবন্ধ মুক্ত-মনা ওয়েব-সাইটে রাখা আছে, উৎসাহী পাঠেরা সেটি পড়ে দেখতে পারেন।

এটা ঠিক যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদি নিয়ামকগুলোর অনেক কিছুই এখনও অজানা, অনেক কিছুই এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাতিত, কিন্তু তা বলে এ নয় যে তার পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক সত্তাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যা অজানা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তার সমাধান নিয়ে আসবেন, এবং তা তারা সমাধান করবেন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞান এগুচ্ছে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুঝতে চান না। যখনই কোন রহস্য সমাধান করতে তারা ব্যর্থ হন, এর পেছনে ঈশ্বরের ভূমিকাকে কল্পনা করে নেন। যখনই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক ফোকর দেখতে পান, এর ভিতরে ঈশ্বরকে গুজে দিয়ে এর একটা সহজ সমাধান দিতে সচেষ্ট হন। এধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শনের পরিভাষায় বলে ‘God in gaps’। একটা উদাহরণ দেই। সৃষ্টির আদিতে অ্যামিনো এসিডের মত জটিল অনু কিভাবে তৈরী হল তার পুরো প্রক্রিয়াটি এখনো আমাদের অজানা। বিশ্বাসীরা স্বভাবতই এর পেছনে ঈশ্বরের হাত থাকার ব্যাপারটি নির্দিধায় মেনে নেন। এটা অনেকটা প্রাচীনকালে বৃষ্টি কিভাবে হয় তা বুঝতে না পেরে এর পেছনে ‘মিকাইল ফেরেস্টা’কে কল্পনা করে গোঁজামিল দেওয়ার মত ব্যাপার। আমরা জানি, যতই বিজ্ঞান এগুচ্ছে এই ধরনের ফাঁক ফোকর থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা ভরাট করবার চেষ্টা করছে। কারণ মানুষ জানে ঈশ্বর বা অন্য কাল্পনিক সত্তাকে হাজির করে কোন কিছু ব্যাখ্যা করা আসলে অজ্ঞানতার সামিল। রাহুল সঙ্কৃত্যায়ন তার ‘নতুন মানব সমাজ’ গ্রন্থে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন - ‘*অজ্ঞতার অপর নামই হল ঈশ্বর। মানুষ তার অজ্ঞতাকে সোজাসুজি স্বীকার করতে ভয় পায় তাই ঈশ্বর নামক একটি সম্ভ্রান্ত নাম খুঁজে বের করেছে।*’ খুবই সত্যি কথা। ‘ঈশ্বর কোন কিছু বানিয়েছেন’ দাবী করা আসলে ঘুরিয়ে পেচিয়ে স্বীকার করে নেওয়া যে - ‘আমি জানি না’। পাঠকদের অনেককেই হয়ত স্কুল জীবনে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় ‘আকাশ নীল কেন’ বা ‘রং ধনু কিভাবে তৈরী হয়’ - এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা স্বভাবতই এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণগুলোই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন পরীক্ষার্থী যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে ‘*আকাশ নীল কারণ আল্লাহ আকাশকে নীল করে তৈরী করেছেন*’ - এ ধরনের উত্তর পরীক্ষার খাতায় লিখে আসে, তবে সে কত নম্বর আশা করতে পারে? স্রেফ শূন্য। পরীক্ষক ধরেই নেবেন যে ‘আকাশ নীল কেন’ এই প্রশ্নের উত্তর সেই পরীক্ষার্থী

জানে না, তাই আবোল-তাবোল লিখছে। তাই নয় কি? কাজেই মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হল তার উত্তরে কেউ যদি বলেন ‘ঈশ্বর বানিয়েছেন’ তবে তা হবে আসলে ওই পরীক্ষার্থীর উত্তরের মতই হাস্যকর এবং অজ্ঞতাসূচক। তাই দর্শনের পরিভাষায় এই ধরনের কুযুক্তিকে বলে ‘Argument from ignorance’।

এবার দর্শন থেকে একটু বিজ্ঞানের জগতে পা রাখা যাক। আমি এর আগের একটি পর্বে বলেছিলাম যে আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্ব প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহা-বিস্ফোরনের মাধ্যমে অতিঘন উত্তপ্ত (hot super densed state) আর অসীম ঘনত্বের এক পুঞ্জীভূত অবস্থা (যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point)) থেকে সৃষ্টি। দেশ কালের ধারণাও এসেছে এই বিগ-ব্যাঙের পর মুহূর্ত থেকেই; কাজেই তার আগে কি ছিল - এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় একেবারেই অর্থহীন। আসলে অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো দিয়ে ওই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা এর আগে দেখেছি নিউটনের সূত্রকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বসহ অন্যান্য যে সূত্রগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে - সিংগুলারিটি বিন্দুতে গিয়ে সেগুলোও কিন্তু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এ ব্যাপারটিকে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন -

A singularity is a place where the **classical concepts of space and time break down** as do all the known laws of physics because they are all formulated on a classical space-time background. ... [T]his breakdown is not merely a result of our ignorance of the correct theory but represents a fundamental limitation to our ability to predict the future [of the singularity], a limitation that is analogous but additional to the limitation imposed by the normal quantum-mechanical uncertainty principle (সূত্রঃ Stephen Hawking, 'Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse' *Physical Review D* 14 (1976): 2460. Since 1982).

তার মানে দাড়াচ্ছে যে, ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন তা করেছেন এক উদ্দেশ্যবিহীন এবং নিয়ম বিহীন অবস্থা (অদ্বৈত বিন্দু) থেকে। বিশ্বাসীরা সর্বদাই এই মহাবিশ্ব এবং মানবজাতীর সৃষ্টির পেছনে এক মহাবুদ্ধিমান এক অজ্ঞাত সত্ত্বার ‘সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য’ এবং ‘অভাবিত দিক নির্দেশনার’ সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি কোন নির্দিষ্ট কারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনই তবে তিনি তা উদ্দেশ্যবিহীন (purposeless) নিয়মবিহীন (lawless) এবং অগোছালো (chaotic) অবস্থার মধ্যে

দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে যাবেন কেন? তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো হওয়া উচিত অনেক বাজায়, ব্যাপ্ত, উদ্দেশ্যমূলক এবং নিশ্চয়তাপ্রদানকারী। কিন্তু বাস্তবতাটি ঠিক উলটা। দার্শনিক Quentin Smith তাই তার *Simplicity and Why the Universe Exists* প্রবন্ধে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন (সূত্রঃ *Philosophy 71 (1997): 125-32*)ঃ

'It has been countered that God could intervene in his creation at the big bang singularity and ensure that it explodes in a big bang that has the laws and physical conditions that lead to the evolution of intelligent life. But this response is implausible, **since this would be an irrational way to create a universe with intelligent beings**; there is no reason to create a singularity that requires immediate corrective intervention to ensure the desired result.'

নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়েইন্গারের কথায়ও লক্ষ্য করা যায় একই সুর (সূত্রঃ *অপার্থিব জামান, ঈশ্বরের অস্তিত্ব- সৃষ্টির যুক্তি খন্ডন, মুক্ত-মনা*)ঃ

‘যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোন মুখের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।’

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের অনেকেই ভেবে নেন যে সৃষ্টির আদিতে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি স্রেফ অলৌকিক একটি ব্যাপার - এবং এই ব্যাপারটি কেবল ‘ঈশ্বর’ নামক একটি সত্ত্বার ‘ভেঙ্কি-বাজি’ দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। এমনভাবে ভাবার কারণও আছে। আমরা ছোটবেলায় পদার্থবিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে - এই যে আমরা আজ চোখের সামনে পরিচিত পদার্থ আর শক্তির জগৎ দেখছি তার উদ্ভব কোথা থেকে ঘটল? কিভাবে শূন্য থেকে পদার্থের সৃষ্টি হল? কিভাবে তৈরী হল আমাদের এ বিশ্বজগৎ? আসলে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ চুকিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পাঠ নিতে হবে। ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকের জন্য বোঝা একটু জটিল। সহজ বাংলায় বললে বলতে হয়, ‘শূন্য থেকে কোন পদার্থ তৈরী হয় না’ - এ ধারণাটি চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের জগতে হয়ত সত্য, তবে কোয়ান্টাম পদার্থের জগতে সত্য নয়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা খুব ভালভাবেই দেখিয়েছে যে, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য থেকে পদার্থ ও শক্তি তৈরী হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটাকে বলে ‘ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন’ (vacuum fluctuation)।

অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার অব অ্যাস্ট্রোবায়লজির অধ্যাপক পল ডেভিসের মতে,

In the everyday world, energy is always unalterably fixed; the law of energy conservation is a cornerstone of classical physics. But in the quantum microworld, energy can appear and disappear out of nowhere in a spontaneous and unpredictable fashion. (*Paul Davies, God and the New Physics. London: J.M. Dent & Sons. 1983, p 162*)

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শূন্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রায়ন, ১৯৭৩ সালে। তবে তারও আগে ‘বিগ-ব্যাঙের জনক’ গ্যামোর মাথাতেও ধারণাটি এসেছিল। গ্যামো তার ‘My World line’ গ্রন্থে ১৯৪০ সালে আইনসটাইনের সাথে কথোপকথনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। গ্যামো খুব হাস্কা চালে সেদিন আইনসটাইনকে বলেছিলেন, ‘আমার এক ছাত্র সেদিন আপনার সমীকরণ গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলো যে একটি নক্ষত্র কিন্তু স্বেচ্ছা শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে, কারণ আপনার সমীকরণে ঋণাত্মক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধনাত্মক ভর-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।’ শুনে আইনসটাইন একটু থমকে দাড়ােলেন। গ্যামো বললেন, ‘আমরা ওই সময় দুজনে রাস্তা পার হচ্ছিলাম, আর এত গাড়ি ঘোড়ার ভীরে আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল’।

আমরা জানি পদার্থের ভর এবং শক্তি সম্পর্কিত হয় আইনসটাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ দিয়ে। যদি পর্যাপ্ত শক্তি বিদ্যমান থাকে, ফোটন থেকে যে কোন সময় পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল তৈরী হতে পারে। এর নাম ‘যুগল উৎপাদন’ (pair production) এবং এই ব্যাপারটিই মহাবিশ্বের ভর সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ট্রায়নের ধারণা অনুযায়ী আমাদের এই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে শূন্যাবস্থা থেকে বড় সড় এক ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে। আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী শূন্যতাকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়- পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে যে শূন্যদেশকে আপাতঃ দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হচ্ছে, তার সূক্ষ্মস্তরে সবসময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থকণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। যেমন, শূন্যাবস্থা থেকে সামান্য সময়ের ঝলকানির মধ্যে ইলেকটন এবং পজিটন (পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল) থেকে

পদার্থ তৈরী হয়েই আবার তা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটার স্থায়ীত্বকাল মাত্র 10^{-21} সেকেন্ড। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন পঞ্জীরাজ ঘোড়ার মত কোন রূপকথার জীব নয়, নয় কোন গাণিতিক বিমূর্ত মতবাদ; বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যবহারিকভাবেই এর প্রমাণ পেয়েছেন*।

রিচার্ড মরিসের ভাষায়,

‘আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে ‘শূন্যতা’ বলে আসলে কিছু নেই। এমনকি সত্যিকার ভ্যাকুয়ামেও প্রতিনিয়ত ভার্চুয়াল কণিকার যুগল ক্রমাগত উদ্ভূত হচ্ছে, আবার বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই সব ভার্চুয়াল কণিকার অস্তিত্ব কোন গাণিতিক কল্পণা নয়। যদিও আমরা এগুলোকে চোখে দেখি না, কিন্তু এগুলোর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এগুলোর অস্তিত্ব যে আছে, এই ভবিষ্যৎবানী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে খুব নিখুঁত ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে’ (Richard Morris, The Edges of Science. New York: Prentice Hall., 1990, p25)

তবে Tryon প্রথমে যে ভাবে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন, তাতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ এই প্রক্রিয়ায় ১৫০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর উদ্ভবের সম্ভাবনাটি খুবই কম। আর দ্বিতীয়তঃ এই মহাবিশ্ব যদি শূন্যাবস্থা (empty space) থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়- আদিতে সেই শূন্যাবস্থা (space)ই বা এলো কোথা থেকে (পাঠকদের এ প্রশ্নে সুরণ করিয়ে দিতে চাই যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, স্পেস কে কিন্তু দেশ কালের বক্রতার পরিমাপে প্রকাশ করা হয়)? ১৯৮২ সালে Alexander Vilenkin এর একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে - মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ‘শূন্য’ থেকে - তবে এই শূন্যাবস্থা শুধু ‘পদার্থবিহীন’ শূন্যাবস্থা নয়, বরং সেইসাথে সময়শূন্যতা এবং স্থানশূন্যতাও বটে। Vilenkin কোয়ান্টাম টানেলিং এর ধারণাকে Tryon এর তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে বললেন, এ মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করেছে এক শূন্য জ্যামিতি (empty geometry) থেকে এবং কোয়ান্টাম টানেলিং এর মধ্য দিয়ে উত্তোরিত হয়েছে অশূন্য অবস্থায় (non-empty state) আর অবশেষে ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে বেলুনের মত আকারে বেড়ে আজকের অবস্থানে এসে দাড়িয়েছে।

* ‘কাসিমির এফেক্ট’ - ১৯৪৮ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিখ কাসিমিরের ভবিষ্যদ্বানী, যা পরবর্তীতে মার্কস স্প্যাগের্গে, স্টিভ লেমোরাক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।

ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে শূন্য অবস্থা থেকে কিভাবে আমাদের এ মহাবিশ্বের উদ্ভব আর বিস্তার ঘটতে পারে তা সাধারণ পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন স্টিফেন হকিং তার বিখ্যাত ‘*দি ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম*’ গ্রন্থে :

There are something like ten million million million million million million million million million million (1 with eighty zeroes after it) particles in the region of the universe that we can observe. Where did they all come from? The answer is that, in quantum theory, particles can be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. But that just raises the question of where the energy came from. The answer is that the total energy of the universe is exactly zero. The matter in the universe is made out of positive energy. However, the matter is all attracting itself by gravity. Two pieces of matter that are close to each other have less energy than the same two pieces a long way apart, because you have to expend energy to separate them against the gravitational force that is pulling them together. Thus, in a sense, the gravitational field has negative energy. In the case of a universe that is approximately uniform in space, one can show that this negative gravitational energy exactly cancels the positive energy represented by the matter. So the total energy of the universe is zero. (*Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, 1988, p. 129.*)

আসলে ১৯৮১ সালে মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের (cosmic inflation) আবির্ভাবের পর থেকেই বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্বিত করে তাদের মডেল বা প্রতিকল্প নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে :David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin of universe as Quantum Tunneling effect" Physical review D25 (1982): 2065-73; S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercolled Phase Transitions in the very early Universe", Physics letters B110(1982):35-38; Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28, Andre Linde, "Quantum creation of the inflammatory Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405 ইত্যাদি। সাধারণ পাঠকদের জন্য পেপারগুলো অতিরিক্ত

প্রায়োগিক এবং জটিল মনে হতে পারে[†], কিন্তু এখানে এই ব্যাপারটির উল্লেখ এ কারণেই করা হল, যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে, বহু বিখ্যাত পদার্থবিদই আজ স্নেফ শূন্যাবস্থা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির সম্ভাব্যতার এই বৈজ্ঞানিক ধারণাটির উপর জোর নজর দিচ্ছেন, হাস্যকর বা ‘ননসেন্স’ ভেবে কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ধারণাটি যদি স্নেফ ‘ননসেন্স’ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না।

ভিক্টর স্টেংগর পেশায় ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াইয়ের ‘ফিসিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমি’ বিভাগের Emeritus Professor এবং কলোরাডো ইউনিভার্সিটির দর্শনের Adjunct Professor. তিনি ‘কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স’ এরও প্রেসিডেন্ট আর নেশায় যুক্তিবাদী। তিনি আমাদের মুক্তমনা ফোরামের একজন সম্মানিত সদস্য। তার ‘[*Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe*](#)’ সাম্প্রতিক সময়ের অত্যন্ত আলোড়ন তোলা বই। তিনি বইটির ‘The Uncreated Universe’ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের নিত্যতার সূত্র লংঘন না করেই কিভাবে শূন্য থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হতে পারে; এবং এর মধ্যে ‘অলৌকিকত্ব’ কিছু নেই। তার ভাষায়-

‘...In other words, NO energy from the outside was required to "create" the universe. What is more, this is also a prediction of inflationary cosmology, which we have seen has now been strongly supported by observations. Thus we can safely say, **No violation of energy conservation occurred if the universe grew out of an initial void of zero energy.**’

সুপ্রিয় পাঠক, আপনারা খেয়াল করবেন- শূন্য থেকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্সুয়েশনের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছেই - এটা কিন্তু আমি হলফ করে বলছি না। মানে, আমি কোন তত্ত্ব পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি না এখানে। যেটা বলতে চাইছি তা হল এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি ‘হতে পারে’, এবং এটি সাম্প্রতিক গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের সাথে মোটেই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে শেষ কথা বলবার সময় এখনই আসে নি। শেষ কথা বলতে পারে বিজ্ঞান। শেষ কথা জানতে চাইলে আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে গত্যান্তর নেই।

[†] অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় লেখা জনপ্রিয় ধারার প্রবন্ধের জন্য Halliwell, Jonathan J. "Quantum Cosmology and the Creation of the Universe." Scientific American 265 (December 1991): 76. দেখুন।

বিজ্ঞান আর দর্শনের পালা চুকিয়ে আমার নিজস্ব কিছু মতামত দেই এবারে। আমার মতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে ‘ঈশ্বরের অস্তিত্বের’ বিশ্বাস-নির্ভর ধারণাটি একটি অপ্রয়োজনীয় ধারণা এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে তা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্ণীত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও ‘ফাঁক’ রয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর নামক এক কাল্পনিক সত্ত্বাকে ঢুকিয়ে সেই ফাঁক পূরণ করবার কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

আমি আমার এই সিরিজটি শেষ করতে চাই একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে। এই ঘটনাটি আমি পড়েছিলাম বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ ডঃ মেঘনাদ সাহার ‘হিন্দু ধর্ম-বেদ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তাকর্ষক বাদানুবাদ’ থেকে। তার বর্ণিত ঘটনাটি এরকম :

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ল্যাপ্লাস তার সুবিখ্যাত ‘Mechanique Celeste’ গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন, গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষিত সমস্ত গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। তিনি যখন গ্রন্থটি নেপোলিয়ানকে উৎসর্গ করবার জন্য অনুমতির প্রার্থী হন, তখন নেপোলিয়ান রহস্য করে বলেনঃ ‘মসিয়ে ল্যাপ্লাস, আপনি আপনার বইয়ে বেশ ভালভাবেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চালচলন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি দেখলাম আপনি সারা বইয়ে কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ করেননি। আপনার মডেলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?’ ল্যাপ্লাস উত্তরে বলেন- ‘Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese’ অর্থাৎ- ‘**Sire, I have no need of that hypothesis.**’ (এই অনুকল্পের কোন প্রয়োজন আমার কাছে নেই।)

এক নজরে আমাদের হাতে চন্দ্র আঁখারের মাস্তুরা

পাঠকের প্রতিক্রিয়া
Reader's Comment